।। প্রথম অধ্যায় ।।

:: ভূমিকা ::

॥ এক ॥

:: বাংলা কবিতায় নগর ও গ্রাম : ঐতিহ্যের বিচার ::

আধুনিক পূর্ব বাংলা কবিতার নগর এবং নাগরিক মানসিকতার স্থান আলোচনা করতে গেলে তাকে দুটি যুগে ভাগ করে দেখা সংগত। ১। পুরাতন কবিতার যুগ ২। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একালের কবিতা। এখানে উল্লেখ থাকে যে আধুনিক শব্দটি বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রোত্তর যুগের সঙ্গে সমার্থক করে দেখছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক শব্দটি দুরকম অর্থেই প্রচলিত। তুর্কী বিজয় থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ; উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে সাহিত্যের ইতিহাসের আধুনিক পর্যায়। এইভাবে দুই যুগে ভাগ করে দেখবার রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু পাশাপাশি আধুনিক শব্দটি অন্য একটি তাৎপর্য বহন করে — রবীন্দ্র প্রভাব পরবর্তী বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক যুগের সাহিত্য বলা হয়। অবশ্যই মধুসূদন এবং জীবনানন্দ দুজনে একই অর্থে আধুনিক নয়। আমরা বর্তমান আলোচনা-সন্দর্ভে আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যকে বুঝিয়েছি। শব্দটির এই অর্থ তাৎপর্য সুবিদিত এবং সুপ্রচলিত। কাজেই বিস্তৃত ভাবে কারণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

বাংলা কবিতার রবীন্দ্রোত্তর কালে একটি বিশেষ প্রবণতা কয়েকজন কবির মধ্যে কি রূপ ধারণ করেছে সে বিষয়ে যথার্থ পরিচয় গ্রহণ করতে হলে শুরুতে পশ্চাত-দৃষ্টি প্রয়োজন। মধ্যযুগে বাংলা কবিতার এই বিশেষ প্রবণতা অর্থাৎ নগর প্রসঙ্গ এবং নগর মনস্কতা ছিল কিনা এবং থাকলে তার স্বরূপ কি সেই বিষয়টির পর্যালোচনা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত

উনবিংশ শতাব্দী থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উক্ত বিষয় এবং মনোভাব বাংলা কবিতায় কি ধরণের স্থান লাভ করেছে তাও ভেবে দেখা দরকার।

তুর্কী বিজয় পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের যে আয়োজন তার মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতাদির অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাধান্য। আমরা এই জাতীয় রচনাগুলির মধ্যেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব। সে যুগে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন রাজসভা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং জনমণ্ডল। ছোট বড় ভূস্বামীরা কাব্য রচনায় কবিদের উৎসাহিত করেছেন, অর্থনৈতিক আনুকূল্য দেখিয়েছেন। কৃত্তিবাস কোন গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, মালাধর বসু রুকনুদ্দিন বরবক শাহর আনুকূল্য পেয়েছিলেন, পরাগল খাঁ এবং ছুটি খাঁর রাজসভার কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী। আরাকানের মগ রাজাদের অমাত্যরা দৌলত কাজী-আলাওলের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি মিথিলায় একাধিক রাজার রাজসভায় অবস্থান করেছেন। ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়- রঘুনাথ রায়ের আনুকূল্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল রচিত। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ছিলেন ভারতচন্দ্র। এরূপ আরো উল্লেখ করা সম্ভব।

রাজসভাকে কেন্দ্র করে সেকালীন নগর গড়ে উঠত। একারণে রাজসভার কবিদের রচনায় নাগরিকতা কিছুটা থাকা সম্ভব বলে মনে হয়। অবশ্য বড় রাজার বড় রাজধানীর কথা বাদ দিলে ক্ষুদ্র ভূস্বামীর অবস্থানকে নগর বলে মনে করা যেত না। সেগুলো গ্রাম-গঞ্জেরই বৃহৎ সংস্করণ ছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তীর অবস্থান কোন আঞ্চলিক ভূস্বামীর

তথাকথিত নগরোপম গ্রামে হলেও তাঁর লেখায় অন্য পাঁচজন মঙ্গলকাব্যের কবিদের তুলনায় নাগরিক মনোভাবের আধিক্য নেই। অবশ্য কালকেতুর গুজরাট নগর নির্মাণ প্রসঙ্গে বা হাটের বর্ণনায় সেকালীন নগরের একটি চিত্র তিনি কাব্যমধ্যে স্থাপিত করেছেন। ভারতচন্দ্রের প্রতিপালক কৃষ্ণচন্দ্র তুলনায় বড় মাপের ভূস্বামী ছিলেন কিনা বলা যায় না কিন্তু মোগল যুগের বিলাস ব্যসন, আদব-কায়দা সেই সভায় পড়েছিল এবং ভারতচন্দ্রের মনের মধ্যে পরিশীলিত নাগরিকতা এমন একটা মাত্রা এনে দিয়েছিল যা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে খুব সুলভ ছিল না। অধিকাংশ সমালোচকই তাঁর পরিশীলিত ভাষারীতিতে এবং অলংকার ব্যবহারে নাগরিক মেজাজের প্রতিফলন লক্ষ করেছেন। তাঁর কাব্যে বর্ধমান রাজ্যের এবং দিল্লী নগরীর যে প্রাসঙ্গিক বর্ণনা আছে তার মধ্যেও কিন্তু নগরজীবনের বস্তুনিষ্ঠ রূপ অনেকখানি ধরা পড়েছে।

তুলনামূলকভাবে অনুবাদ কাব্যের কবিরা বড়রাজাদের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। অনুবাদ কর্মে তাঁদের অনেকেরই নিপুণতা তথা পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। মালাধর বসু থেকে শুরু করে সৈয়দ আলাওল পর্যন্ত কাউকেই প্রায় জনমনোহারী কবি বলা যায় না। মালাধর বসু মূল ভাগবতের খুব কাছে তাঁর অনুবাদকে রেখেছিলেন। কবীন্দ্র ও শ্রীকরণ মুসলমান সেনাপতিদের মনোরঞ্জনের জন্য কাব্যানুবাদ করেছিলেন। দৌলত-কাজী আলাওলে উচ্চতর শিল্পমনের যে পরিচয় আছে তা মগন ঠাকুর প্রমুখ আমাত্যদের ও অন্যান্য সভাসদদের মনোরঞ্জনের জন্যেই পরিকল্পিত। কৃত্তিবাসের প্রসঙ্গ আনা হোল না একটাই কারণে অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্য তাঁর রচনার যে নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, তাতে জনসাধারণের জীবন, বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভূত উপকরণ স্থান পেয়েছে– উচ্চস্তরের নাগরিক বৈদগ্ধ্য প্রায় কোথাও অবশিষ্ট নেই।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি অংশ জুড়ে এই ভাবে যে নাগরিক ও অর্ধ-নাগরিক মানসিকতার প্রকাশ দেখি তার স্বাতন্ত্র্য আরো ভাল ভাবে অনুভব করা যায় মঙ্গলকাব্যের গ্রামীণতার সঙ্গে তুলনা করলে। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যেই বাংলার গ্রাম জীবনের সরল বাস্তবতা প্রতিফলিত। পৌত্তলিক আচার-আচরণে, পারিবারিক বন্ধনে, জীবনের জাত কর্ম থেকে প্রেত কর্ম পর্যন্ত সর্বত্র, নারীর পতিনিন্দা থেকে বিবাহবাসর পর্যন্ত প্রতি স্তরে গ্রাম জীবনের সত্য ছবি আছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে গ্রামের প্রকৃতি ও জীবন যেমন সত্য, তেমনি সত্য বৈষ্ণব ধর্ম সাধনার পান্ডিত্য পূর্ণ উৎকর্ষের প্রভাব। এ অনেক বৈষ্ণব কবি তত্ত্ববিদ ছিলেন এবং অজস্র বৈষ্ণব আখড়া ও আশ্রমে দেশ পূর্ণ ছিল। সাধারণ ভাবে গ্রামীণ পরিবেশে অবস্থিত হলেও শাস্ত্রানুচর্চায় ও সাধন ভজনের বিশিষ্টতার জন্য এগুলি নিজেদের চারপাশে পান্ডিত্যের একটি স্বতন্ত্র চৌহদ্দি তৈরী করেছিল।

বৈষ্ণব পদাবলীর অনেক কবি সাধক পন্ডিত ছিলেন- যেমন জ্ঞানদাস প্রমুখ, অনেকে ছিলেন না — যেমন চৈতন্য পূর্ব চন্ডীদাস প্রমুখ, কিন্তু কবিতা রচনার ক্ষেত্রে গ্রাম্য প্রকৃতি ভাব-ব্যাকুলতা, সরলতা এঁদের রচনায় পরিস্ফুট। আবার গোবিন্দ দাস প্রমুখ আরেক শ্রেণীর কবিতায় ভাষার পরিশীলিত রূপ-সৌকর্য–যার সঙ্গে নাগরিক বৈদগ্ধের সম্পর্ক বেশী তার নিদর্শন পাওয়া যায়। বৈষ্ণব মোহান্তরা এবং প্রধান সাধকবৃন্দ পুরী বৃন্দাবনের মত তীর্থকেন্দ্রিক নগরে বাস করতেন। এঁদের তত্ত্বভাবনার পেছনে এই নাগরিক অবস্থানের কিছু প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত: উল্লেখ থাকে যে চৈতন্য ভাগবতের কবি বৃন্দাবন দাস সেকালের বাংলার সমৃদ্ধ নগর ও বিদ্যাকেন্দ্র নবদ্বীপের বর্ণনায় উল্লাস প্রকাশ করেছেন।

মিথিলার বিদ্যাপতি বাংলার কবি ছিলেন না, কিন্তু বাঙালীর অতিপ্রিয় কবি ছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস সম্ভবত: তাঁর অল্প পরের লোক—বড়ুর পাত্র-পাত্রীর বর্ণনায়, পরিস্থিতির উদ্ভাবনে, বাংলার গ্রাম জল মাটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিদ্যাপতির পদাবলী কিন্তু নাগরিক জীবন ও মনের পটভূমিতে অবস্থিত— বিদ্যাপতির কৃষ্ণ যেন রাজপুত্র অভিজাত নাগরিক, অপরপক্ষে বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ সমস্তরের ইন্দ্রিয়দুর্বল হলেও এক পল্লী যুবক।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় বিশ্লেষণ করে নগর ও পল্লীর পারস্পরিক ভূমিকাটি দেখিয়ে দেওয়া আমাদের বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য নয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের সাহায্যে আমরা দেখাবার চেষ্টা করলাম যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের পাশাপাশি নগর জীবনের প্রকাশ বড় কম ছিল না। পল্লী কবির সরল প্রত্যক্ষ মনোভাবের পাশাপাশি নাগরিক পরিমার্জনা এবং বৈদগ্ধ বারংবার লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি কথা মনে হয় যে অভিজাত রাজসভা-আশ্রয়ী বিদগ্ধ কবিমণ্ডলী অথবা ধর্ম কেন্দ্র নির্ভর পণ্ডিতসাধক কবিরা কেউই গ্রামীণ সাধারণ মানুষের থেকে বহুদূরবর্তী ছিলেন না। যারাই কথকতার মধ্য দিয়ে পালাকীর্তনের আসরে, অষ্টমঙ্গলা বা ভাসানের গানে জনসাধারণের কাছে পৌঁছুতেন তাদেরই নাগরিক সীমাবদ্ধতা অনেক পরিমান মুক্ত হত। কীর্তনের আসরের মধ্য দিয়ে বিদ্যাপতি বা কথকতার মাধ্যমে কৃত্তিবাস নগর-গ্রাম নিরপেক্ষ সর্বস্তরের কবি হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য ভারতচন্দ্রের মত কবিকে সহজে আয়ত্ত করা গ্রামীণ শ্রোতাদের পক্ষে তত সহজ ছিল না—একারণে গোপাল উড়েদের যাত্রার মাধ্যমে তাঁকে তরল করে নিতে হয়েছিল।

এবারে আমরা বৃটিশ শাসন কালের বাংলা কবিতার কথায় আসছি। মোটামুটি ভাবে ১৮০০ সাল থেকে নব্য বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ধরে নেওয়া যায়, অবশ্য তা সৃজনশীল সাহিত্য নয়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার আগে যা লেখা হয়েছে তাকে ঠিক নব্য কবিতায় শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। নব্য কবিতার জন্মের আগেই কিন্তু বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। আমরা এখানে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নব্যযুগের সূচনা হল তার সাধারণ বৈশিষ্ট্য গুলি নিয়ে আলোচনা করছি না। কারণ আমাদের অভিসন্দর্ভের পক্ষে তার কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। সে বিষয়ে আমাদের কোন নতুন পর্যবেক্ষণ নেই। এই পরিবর্তনের একটি মাত্র অর্থনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ফলের দিকে আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি — তা হল কোলকাতা মহানগরীর অভ্যুত্থান। বৃটিশ যুগে কোলকাতা মহানগরীর অভ্যুত্থানের সঙ্গে পূর্ব পূর্ব যুগের নগর ও শহরের জন্মের কোন তুলনা হয় না। যদি আমরা বঙ্গদেশের দিকে লক্ষ করি তো দেখব মধ্যযুগ পর্যন্ত সারা বাংলাই সাহিত্যের উৎসভূমি ছিল। যেসব নগরকেন্দ্রিক সাহিত্যিকদের কথা বলেছি তাঁরাও গৌড়ের, চট্টগ্রামের কৃষ্ণনগরের, সীমানার বাইরেকার-মিথিলার বা রোসাঙে ছড়িয়ে ছিলেন। কতকগুলি ছিল রাজার রাজধানী নগরী, কতকগুলি ছিল তীর্থনগরী, কতকগুলি ভূস্বামীর অবস্থান কেন্দ্র। তাছাড়া অজস্র ধর্মকেন্দ্র সারাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করে সাহিত্য-সৃষ্টির উৎসস্থল গুলি আর সেভাবে জীবন্ত রইল না। লোক কবিরা মাঠে ঘাটে গান ছড়া তখনও লিখে চলেছেন কিন্তু লিখিত শিষ্ট-সাহিত্যের সৃষ্টি-ভূমি দ্রুত কেন্দ্রভূত হতে লাগল মহানগরী কোলকাতার দিকে। নব্য বাঙালী জাতীয় অভ্যুত্থান এবং কোলকাতা মহানগরীর উৎপত্তি ও বিকাশ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। কোলকাতা মহানগরী নব্য শিক্ষা, রাজনীতি, সামাজিক, আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের পীঠস্থান হয়ে উঠল। বাংলা থিয়েটার তৈরী হবে কোলকাতায়, ছাপাখানা —

সংবাদপত্র কোলকাতায়, কোলকাতায় না গেলে চিত্তের মুক্তি নেই, অর্থের বিকাশ নেই, সাহিত্যের বাজার নেই— এই সেদিনও রাঢ়ের প্রাণপুরুষ তারাশঙ্কর কোলকাতার ভাড়াবাড়ীতে বাস করে সাহিত্যের অঙ্গনে আপনাকে প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। যিনি গ্রামের কথা বলেছেন, গ্রামের ভাব প্রকাশ করেছেন তাঁরও অবস্থান নগর কোলকাতায়। মহানগরী কোলকাতা নব্য পল্লী প্রেমের উৎস,ধারক এবং নব্য বাহক।

সারা ভারতে মহানগর হিসাবে কোলকাতার অবস্থান একটু স্বতন্ত্র রকমের। মারাঠী সংস্কৃতি পুনে নাগপুরে বিভক্ত, কিছুটা বোম্বাইকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছে। বারাণসী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌতে উত্তর প্রদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ত্রিধা বিভক্ত অবস্থান। তামিল সংস্কৃতিও নব্যযুগে মাদ্রাজের পর দ্বিতীয় নগর কেন্দ্র হিসাবে মাদুরাইকে পেয়েছে। কিন্তু বৃটিশ যুগের দ্রুত অগ্রসর, সবচেয়ে বিস্তৃত, সংস্কৃতি ও সাহিত্য কর্মে সফল বঙ্গদেশবাসী কিন্তু কোলকাতা সর্বস্ব। ঢাকায় তার দ্বিতীয় মহানগরী কখনোই ঠিকমত গড়ে ওঠেনি।

এর ফলে বাংলা সাহিত্যে বৃটিশ যুগে এক ধরণের আরবানাইজেশন (Urbanization) বা নগরকেন্দ্রিকতা একটি বিশিষ্ট ধর্মরূপে দেখা দিয়েছে। এর সুফল কুফল দুই-ই আছে— এর ফলে একদিকে মানোন্নয়ন অন্যদিকে প্রভাব সংকোচন দুইই দেখা দিতে পারে এবং দিয়েছে। বাংলা সাহিত্য পশ্চিমের সঙ্গে প্রতিস্পর্ধা করে মানে বেড়েছে কিন্তু নগরের বাইরে ছড়িয়ে থাকা জীবন ও মনের সজল শ্যামল স্বাভাবিকতা সে পরিমাণে আয়ত্ত করেছে কি ? বিষয় হিসেবে পল্লী যতটা এসেছে সবটাই ধরা পড়েছে নাগরিক শিক্ষিত মনের চোখে। আর এই নব্য সাহিত্য-বাস্তবতা অজস্র গ্রামীণ সাধারণ সুস্থ শিক্ষিত মানুষ থেকে দূরেই থেকেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত থেকে কবিতায় এবং ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে গদ্যে প্রত্যক্ষ বিষয়বস্তু রূপে কোলকাতার আবির্ভাব। বড় মাপের কবিরা যখন এলেন-যেমন মধুসূদন দত্ত তখনো পুরাণাশ্রয়ী মহাকাব্যে মহানগরী লঙ্কা যেন কোলকাতার মানস প্রতিরূপ হয়ে উঠল। শহরবাসী মহাকবির বাল্য স্মৃতির পল্লীর জন্য দীর্ঘশ্বাস চতুর্দশ পদাবলীতে মাঝে মাঝে শোনা গেলেও সেখানেও গ্রামের চেয়ে শহর কিছু কম সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে এক ধরণের পল্লী ব্যাকুলতা রোমান্টিক লিরিকের কবি বিহারীলালের আগে আমরা পাই না। পল্লীগ্রামে গিয়ে নাম ধাম লুকিয়ে তার শ্যামল সজল সরল সৌন্দর্যকে পাবার ব্যাকুলতা কবি প্রকাশ করেছিলেন। রোমান্টিকতার একটি প্রধান লক্ষণ হিসাবে, বিহারীলাল থেকে বাংলার নাগরিক কবিরা দূর পল্লীর এবং প্রকৃতির সান্নিধ্য কামনা করেছেন, নগরকে কারাগার বলে বিরূপতা দেখিয়েছেন। আসলে এই পল্লীমুখীতাও নগরবাসী মানসিকতার এক ধরণের প্রতিক্রিয়া মাত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত বিহারীলাল প্রবন্ধটিতে এই রোমান্টিক প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যদি গ্রামীণ হতেন তো গ্রামে বসে শহরের জন্য হয়তো ঠিক এভাবেই দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। যাই হোক রোমান্টিক তৃষ্ণার পথ ধরেই এ যুগের বাংলা কবিতায় পল্লীগ্রাম এবং পল্লী প্রকৃতি প্রবেশ করল।

বাংলা কবিতায় পল্লীমুখীন বাতাবরণ তৈরীতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অতি বিশাল। তিনি নিজে কোলকাতার থেকে যখন পদ্মার তীরবর্তী পল্লীপুনিতে পরিভ্রমণ করেছিলেন তখনই তাঁর কাব্য সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ পরিণতি দেখা দিয়েছিল- এই সত্য তিনি কখনোই ভুলতে পারেন নি। যার ফলে তাঁর কবিতায় গল্পে নাটকে, পল্লীবাংলা তার জীবন এবং প্রকৃতি নিয়ে অজস্র ধারায় বিচিত্ররূপে ছড়িয়ে আছে। শুধু বাংলার নদীমাতৃক পূর্বাঞ্চল নয়, রুক্ষ রাঢ়-তার কোপাই-এর শীর্ণ ধারা, বোলপুর ভুবন ডাঙ্গার মাঠ-অন্যভাবে অর্থবহ

হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে এবং সৃষ্টিতে। তাঁকে ঘিরে শান্তিনিকেতনে এক নতুন ধরণের পল্লী গড়ে উঠেছিল। কোলকাতার জোড়াসাঁকো এবং বীরভূমের শান্তিনিকেতনের মধ্যে তাঁর মন যাতায়াত করেছে। জোড়াসাঁকো আরো যত ইঁট কাঠে, যন্ত্রে বাণিজ্যে ভরে উঠেছে ততই তার ওপরে পত্র পল্লবের বাতাবরণ তাঁর শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে এসে কবি সৃষ্টি করেছেন। কবি সমুচ্চ কণ্ঠে নগর সভ্যতার নিন্দা করেছেন, যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধাচারণ করেছেন, খুব উন্নত মনের অনেক সৃষ্টিতে তাকে ভর্ৎসিত করেছেন— তবুও রবীন্দ্রনাথ কোলকাতা মহানগরীর বুকের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছেন, তাঁর রচনায় অপরিণতির সময় থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও গ্রামীণতা নেই, ভাষায় রীতিতে এবং দ্রুত গতির বিবর্তমানতায় সব কিছু অত্যুজ্জ্বল এবং নাগরিক। তাঁর প্রকৃতিতত্ত্ব, তাঁর অতীতত্ত্ব এসবের মধ্যেও আছে আধুনিক চিন্তা ও অধ্যয়নের প্রতিফলন।

রবীন্দ্রনাথের নগর কোলকাতা এবং পল্লী বঙ্গ একাধিক গ্রন্থের বিস্তারে আলোচিত হতে পারে। সেরূপ কোন কিছু করার চেষ্টা আমরা করছি না। আমরা শুধু বর্তমান প্রসঙ্গটির অভিমুখে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার সারাৎসার উল্লেখ করছি।

বিহারীলাল প্রমুখ রোমান্টিকদের প্রভাবে যা কিছুতেই হত না রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তা হল— বাংলা কবিতায় পল্লী প্রবণতার আবেগপ্রবণ ধারা একটা গুরুতর ভূমিকা নিয়ে দেখা দিল। এ বিষয়ে রবীন্দ্র প্রভাবের পাশাপাশি গান্ধীজির 'পল্লীতে ফিরে যাও' এই আন্দোলন কিছু পরোক্ষ প্রভাব হিসাবে কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের অনুজ কবিরা যেন পল্লী প্রসঙ্গকেই কবিতার অপরিহার্য বিষয় বলে মনে করতে আরম্ভ করলেন। এঁদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন মল্লিক আজীবন পল্লীবাসী ছিলেন এবং জসিমউদ্দীন পল্লীজীবনের মধ্য থেকেই উঠে এসেছিলেন এবং পল্লীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।

বাকী অনেকেই যেমন কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বন্দে আলীমিয়া, গোলাম মুস্তফা, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, গিরীন্দ্রমোহনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মূলতঃ নগরবাসী কিন্তু কবিতা রচনায় পল্লীমুখী। সাধারণ মানুষের কাছে কবিত্ব এবং পল্লীপ্রেম কবিতার বিষয় এবং গাছ ফুল, লতা, পাতা-মাঠ-ঘাট ইত্যাদি অপছন্দ হয়ে উঠল। এর বিরুদ্ধে সমকালীন কয়েকজন কবির মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পল্লীর বিষয়বস্তু কখনো কখনো গ্রহণ করলেও কোন বিশেষ ধরণের ভাবালুতা অনুভব করেন নি। যতীন্দ্রনাথ সেন পল্লী বিমুখ, প্রকৃতি বিমুখ হয়ে উঠলেন। প্রমথ চৌধুরী মনন ও শিল্পের দিক থেকে একেবারেই গ্রামীণতা বিরোধী, অভিজাত ও নাগরিক। মোহিতলাল মজুমদার কবিতাকে দার্শনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত করলেন এবং বঙ্গ কবি সম্পর্কে বিমুখ রইলেন। এই সময়ে কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে নব্য কবির দল দেখা দিলেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভাব কল্পনার বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র বঙ্গ পল্লীর নিভৃত আলয় থেকে বাংলা কবিতাকে দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারে মুক্তি দিতে চাইলেন। তবে নজরুল ইসলাম বিশেষ ভাবে পল্লী প্রেমিক না হলেও এবং রবীন্দ্র ভাবমার্গের পথিক না হওয়া সত্ত্বেও পল্লীজীবন ও প্রকৃতি নিয়ে কবিতা লিখেছেন, আবার পাশাপাশি রাজনৈতিক বিষয় বিতর্ক, সাম্যবাদীচেতনা, শহরকেন্দ্রিক গণ আন্দোলন এসব বিষয়েও মনোনিবেশ করেছেন– তাঁর মধ্যে এক ধরণের ভারসাম্য লক্ষ করা যায়।

এই সময়ে বিংশ শতকের তিনের দশকে বাংলা কবিতা যথার্থ আধুনিকতার স্তরে প্রবেশ করতে থাকে।

॥ দুই ॥

:: রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় নগর ও নাগরিকতা ::

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে যখন তিনি পূর্ণ শক্তিতে কাব্য রচনা করে চলেছেন তখনই ১৯৩৫ সালে জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রনাথ সেন নজরুল ইসলাম বা কল্লোলের কবি গোষ্ঠী যে ধরণের রবীন্দ্র বিরোধীতার সূচনা করেছিলেন জীবনানন্দের কাব্যটির ঢঙ তার থেকে পৃথক। জীবনানন্দ-এর আগে 'ঝরাপালক' নামে একটি কাব্য লিখে-ছিলেন তাতে সমকালীন, ঈষৎ পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাবই বড় ছিল। ধূসর পাণ্ডুলিপি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরণের কাব্য। রবীন্দ্র ভাব পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে না এসে এমন কী যতীন সেন- নজরুল-প্রেমেন মিত্র থেকে স্বতন্ত্র না হয়ে এ কাব্যের তাৎপর্য ধরা যায় না। তিনি আপাতদৃষ্টিতে কোথাও রবীন্দ্র বিরোধী নন কিন্তু এ অন্য জগতের ভাষা, অন্য জগতের উপলব্ধি, অন্য স্বরের উপভোগ। পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে নারীকে একই সঙ্গে ভালবাসা ঘৃণা করা ও অবহেলা করার বহুমাত্রিক মিশ্রণে এবং সবকটা ইন্দ্রিয়কে প্রজ্বলিত ও পর্যস্থ করে স্বাদ নিষ্কাষণে, মৃত্যুকে এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে তথা জীবনের কেন্দ্র মৃত্যুকে উপলব্ধি করে এই কবিতা এক অভিনব জটিল অভিজ্ঞতার বস্তু হয়ে উঠেছে। এ কারণেই অনেক সমালোচক মনে করেন রবীন্দ্র জীবৎকালেই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার যাত্রা শুরু হয়। জীবনানন্দ আমাদের আলোচনার বিষয় নয় এবং জীবনানন্দের সাহায্যে আমাদের বর্তমান অভিসন্দর্ভ পুষ্ট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। কারণ তিনি আশ্চর্য ভাবে বাংলা পল্লীকে তাঁর কবিতায় নিয়েছেন, নিয়েছেন কোলকাতা শহরকেও, বর্তমানকে যেমন তেমনি অতি প্রাচীনকেও নিয়েছেন, সমুদ্রকে, অরণ্যকে, বিদর্ভ ব্যাবিলনকে সমভাবে —

এ শুধু প্রেমেন মিত্রের দু:সাহসী অভিযান নয়— উপলব্ধির গভীর অভিঘাতে বাংলা কবিতার চারদিক থেকে বন্ধ দরজা জানালার উন্মোচন।

একালের বাংলা কবিতার বিবিধ লক্ষণের মধ্যে নগরমুখীতা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ বলে অভিহিত হয়ে থাকে। কোন কবির লেখায় তার ভূমিকা বিস্তৃত, কারো লেখায় তুলনামূলক ভাবে সংকীর্ণ। কিন্তু আধুনিকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত কবি, বিষয় হিসাবে কখনো পল্লীকে নিতে পারেন কিন্তু পল্লীতেই মুক্তির দ্যোতনা, নগরের বন্দীত্ব থেকে নিসর্গেই মুক্তি এরূপ প্রত্যয়ে কেউ বিশ্বাসী নয়। আধুনিক কবির জটিলতায়, তীর্যকতায়, তীক্ষ্ণ সমাজ চৈতন্যে, জীবনের রূঢ় বাস্তবতার উদঘাটনে, রূঢ় কর্কশ যান্ত্রিকতার মুখোমুখি হওয়ায়, রাজনৈতিক চেতনায়, সংগ্রামে, বেদনায় কোলকাতা শহর সর্বব্যাপী। প্রত্যক্ষ ভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে একালের কবিতার নব্য লক্ষণগুলি তাকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের উপলব্ধির ও উপভোগের বস্তু করেছে। বস্তুতপক্ষে নগরের শিক্ষিত সাধারণ পাঠক শ্রেণীর একটা অংশও সংক্ষিপ্ত পড়ুয়া মাত্র আধুনিক কাব্যের পাঠক। দুরূহতা ও দুর্বোধ্যতার অভিযোগ বারে বারে আসে, বিদেশী ভাব-ভাবনা সহজে বাংলা কবিতায় স্থান পায়-তাতে তার দুর্বোধ্যতা বেড়ে যায়, ফলে নবীন কবিদের সামনে যে পাঠককুল তারা যেন শুধুই এই শহরের। কবিরাও মূলত: শহুরে হয়তো বাস্তবত: কেউ মফস্বল শহরে লেখাপড়া করেছেন, কেউ হয়তো কর্ম ব্যপদেশে মফস্বলে থাকেন তবু সেই সব অবস্থান কেন্দ্রও তাঁরা ছোট গন্ডীতে সীমাবদ্ধ এবং সকলেরই মনের যোগ কোলকাতায়। এঁদের কবিতায় কখনো গ্রাম আসে-দূর থেকে দেখা গ্রাম, পরিশীলিত শহুরে বক্রমনে দেখা গ্রাম। জীবনানন্দের গ্রামই কি বাংলার গ্রাম ছিল ? চমৎকার ছবি, আন্তরিক ভালবাসা তবু যে চোখ দেখেছে, যে মন সম্ভোগ করেছে, তার পরিপুষ্টি নাগরিক চিন্তা চেতনায়।

এই বিশেষ দিকে দৃষ্টি দেবার উদ্দেশ্যেই আধুনিক বাংলা কবিতার তিনজন কবির পর্যালোচনা করছি। সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং বীরেন্দ্র চক্রবর্তী সময়ের দিক থেকে ক্রমানুযায়ীক। সমর সেনের পর সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং তারপর বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। সমর সেনের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের রচনা সমসাময়িক, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠার পর কবি হিসাবে খ্যাত হন। তারপরে এখনো পর্যন্ত তাঁরা পাশাপাশি লিখছেন। এই তিনজন কবি ব্যক্তিত্ব শিল্পবোধ এবং জীবনচেতনার দিক থেকে স্বতন্ত্র। কিছু কিছু মিল অবশ্যই আছে তবে পার্থক্যের দিকটাই গভীরতর। ঐ তিনজন কবিকে তাঁদের ভাব কল্পনায় সামগ্রিকতায় নয়— বিশেষ ভাবে নগরচেতনার দিক থেকে দেখবার সুযোগ আছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। এক অর্থে নবীন কবিরা যে সবাই নগরচেতনা-সম্মুখ সে কথা আমরা আগেই বলেছি। সেদিক থেকে কিছু পূর্বের বা সমকালের কবিদের তুলনায় এঁরা যে একটা স্বতন্ত্র স্তরে অবস্থান করেন এমনও নয়। যদি নাগরিক মনোভাবের কথা বলি তো বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তীর প্রসঙ্গ উঠতেই পারত। তবে আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার সময়টা থেকে পরবর্তী তিন দশক পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি। এভাবে সূচনার কারণ হল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নাগরিক সত্যকে আরো নগ্ন করেছে। মহাযুদ্ধ উত্তরকাল নগরকে একদিকে অনেক বেশী রাজনীতি সচেতন করে তুলেছে, অন্য দিকে নব নব প্রযুক্তির বৈপ্লবিক অগ্রগতি নগর জীবনকে তীব্র আকর্ষণের কেন্দ্র রেখেছে। গ্রামীণতা দ্রুত নাগরিকতার সমীপবর্তী হবার সাধনা করেছে অথবা নাগরিকতা দ্রুত গ্রামকে গ্রাস করতে চলেছে। এই কথা মনে রেখেই আমরা এই তিন কবির কাব্য-চর্চায় প্রবেশ করেছি এবং গোড়াতেই নিবেদন করে রাখি যে শিল্পগত বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী এবং নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়ণ থেকে আমরা বিরত থেকেছি॥

• • •

****